বার হারবারের গ্রামে দোকান আছে, দোকানি নেই

রজত রায়

বার হারবার ?

পার্ল হারবারের কথা তো সবাই জানি। শৈশবে যখন বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন থেকেই পার্ল হারবার নামটা মাথার মধ্যে গেঁধে গেছে। খবরের কাগজে বিশাল বিশাল হেডিং হল ১৯৪১ -এর ৭ ডিসেম্বর, জাপানিরা পার্ল হারবারে বোমা ফেলল। দ্বিতীয় মহ াযুদ্ধ তখন একেবারে তুঙ্গে। আমেরিকা এতদিন মিত্রশক্তির সঙ্গে সহায়তা করে নেপথ্য থেকে লড়াই করছিল। ১৯৪১ -এর৭ ডিসেম্বর যখন পার্ল হারবারে মার্কিন নৌঘাঁটিতে জাপানিরা এসে বোমা ফেলল, সেই দিন থেকেই আমেরিকা সরাসরি জার্মানি আর জাপানের বিদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ল।

গোটা পৃথিবীময় আলোড়ন, তার ঢেউ বাংলাদেশের (অবশ্যই অভিভক্ত ভারতবর্ষে) এক প্রত্যন্ত মফস্বল শহরেও এসে আছড়ে পড়েছিলো। খবরের কাগজের বড় বড় হেডিং বড়দের উত্তেজিত আলোচনা -- সবই ছোটদের মনেও গেঁথে গিয়েছিল।

পরে বড় হয়ে পার্ল হারবার সম্বন্ধেঅনেক কিছু জেনেছি। জেনেছি যে প্রশান্ত এই দ্বীপগুলিতে আমেরিকার বিরাট এক নৌবহরের ঘাঁটি ছিল।

১৯৫৯ এর ২১ আগস্টএই দ্বীপপুঞ্জগুলি হাওয়াই রাজ্য নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য হিসাবে যোগ দেয়। যদিও জায়গা টি মার্কিন যুক্তরাষ্টের পশ্চিমপ্রান্তের মূল ভূখণ্ড সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো থেকে ২৩৯৭ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত।

পার্ল হারবারের কথা ইতিহাসের বইয়ে যেমন পড়েছি, তেমনই সিনেমাতেও দেখেছি বহুবার। 'টোরা! টোরা! টোরা!' ছবিটি এবং স্টিভেন স্পিলবার্গের '১৯৪১' তো এখনও পরিস্কার চোখের সামনে ভাসছে। কিন্তু বার হারবার বলে কোন জায়গার নাম তো আগে কোনদিন শুনিনি। কাজেই নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ডের বাড়িতে বসে সেপ্টেম্বর মাসের এক সকালে যখন আমার আমেরিকান (অনাব াসী ভারতীয়) নিক ট - আত্মীয়দের বলাবলি করতে শুনলাম, চল, কিছুদিন বার হারবার থেকে বেড়িয়ে আসি, তখন কিছু না জেনেই স ায় দিয়ে দিলাম। বেড়াতেই যখন বেরিয়েছি, তখন ভলাডিভস্টকই বা কী আর সান্ ফ্রান্সিস্‌কোই বা কী; আর বার হারবারই বা কী! সবই তো অদেখা জায়গা, কাজেই বার হারবারে যাবার প্রস্তাবেও সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম।

কিন্তু একেবারে কোন কিছু না জেনে আনাড়ির মতো দেশভ্রমণ করা কোনওদিনই আমার ধাতে নেই। তাই বইপত্র আর ম্যাপ ঘেঁটেঘুঁটে বার হারবারের পরিচয় বের করে ফেললাম। পার্ল হারবারের একেবারে বিপরীত মেতে বার হারবার। একটা সুদূর দক্ষিণ-পশ্চিমে আর একটা চূড়ান্ত উত্তর পূর্ব। মাঝে প্রায় সাত - আট হাজার মাইলের ব্যবধান (আমেরিকায় কিলোমিটারের হিসেব চলে না, সেখানে সবকিছুর দূরত্ব আজকের দিনেও মাইলের হিসেবেই করা হয়)।

বার হারবার হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একেবারে উত্তর - পূর্ব মেইন রাজ্যের অন্তর্গত ছোট্ট একটি শহর, যেটা প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অজস্র লেক আর নদী - নালা দিয়ে ঘিরে রাখা। জনসংখ্যা মাত্র ৪৪০০, কলকাতার একটি মিউনিসিপ্যালিটি ওয়াডের সমান। আর এই মেইন রাজ্যটাও যে কত ছোট, তার প্রমাণ গোটা রাজ্যটির জনসংখ্যা বারো লাখের কিছু কম অর্থাৎ পুরো মেইন রাজ্যটা হল বৃহত্তর কলকাতার প্রায় দশভাগের একভাগ।

ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীদের এই জায়গাটার ওপর প্রথম নজর পড়ে ১৪৯৮ তে। তারপর প্রায় সওয়া'শ বছর বাদে ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বাহিনী প্রথম জায়গাটিকে পুরোপুরি দখল করে নেয়। ফরাসিরাও জায়গাটার জন্য মরিয়া হয়ে লড়াই করেছিল এবংবেশ কিছুদিন এটা ফরাসি উপনিবেশের অন্তর্গত ছিল। অবশেষে ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে এক প্রচণ্ড যুদ্ধের পর জায়গাটাতে মোটামুটি একটাস্থিত াবস্থা এল এবং এটিকে ম্যাসাচুসেটস্ রাজ্যের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ৪৫ বছর বাদে ১৮২০ তে মেইন রাজ্যটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২৩ তম রাজ্য হিসেবে যোগ দিল।

এই রাজ্যটির জমি এত উর্বর যে ফল - মূল - শাক - সব্‌জি এখানে হল অফুরন্ত। গোটা আমেরিকায় যত ব্লু বেরি ফল হয়, তার ৯৮ শতাংশ উৎপন্ন হয় এই রাজ্যে। এই রাজ্যের অঢেল ফসলের মধ্যে প্রধান হল আপেল এবং আলু। অন্যান্য তরিতরকারি এবং শ াকসবজিও হয় অন্তহীন। এখানকার মাখন, চীজ, আর দুধের জিনিস খুবই বিখ্যাত। হাঁস মুরগির পোলট্রিতে যত ডিম আর মাংস হয় ত া রাজ্যেরর সাড়ে এগার লক্ষ মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় প্রায় দশগুণ বেশি। আর সমুদ্র এবং লেক থেকে (এই রাজ্যে লোকের সংখ্য

া আড়াই হাজারের ওপর, আর নদী-নালা-খাল-বিল পাঁচ হাজারেরও বেশি) ধরা হয় বিখ্যাত দামি খাবার লবস্টার। গোটা অ ামেরিকায় যত লবস্টার জল থেকে তোলা হয় তার ৯০ শতাংশ -ই এই মেই রাজ্য থেকে।

কাজেই আকর্ষণ হবারই কথা। তার উপরে মানচিত্র থেকে দেখতে পেলাম ওই জায়গাটির কাছাকাছি, প্রায় ১০০ মাইল জুড়ে নদীর মে াহনা, লেক, সমুদ্র আর অসংখ্য দ্বীপ মিলিয়ে জায়গাটির চেহারা প্রায় আমাদের সুন্দরবনের মতো। কিন্তু মস্ত বড় তফাত হল সুন্দরবনে পাহাড় নেই; আর বার হারবারের চারপাশ দিয়ে ছোট ছোট অসংখ্য পাহাড়।

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নীল আকাশ আর রোদ ঝলমলে একটি দিনে আমরা গাড়ি করে সকাল আটটা নাগাদ নিউ ইর্য়কথেকে বার হারবারের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। কিশোরী কন্যা। কন্যাটিকে মেইন রাজ্যেরর বড় শহর লিউসস্টোনে নামিয়ে দিতে হবে।সেখানে সে ৰিবিদ্যালয়ের পড়াশুনা করছে। সকাল আটটায় ঠান্ডা গাড়িতে চড়ে আমরা চারশো আশি মাইলের যাত্রা শু করলাম। নিউ ইয়র্ক শহরের সীমানা ছাড়িয়ে কনেকটিকট্ রাজ্যে প্রবেশ করলাম। চওড়া বিশাল রাস্তা, চারটি করে লেন। রাস্তাগুলি ঝক্ঝক্ করছে আয়নার মতো, আর চালকের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ঝোলানো আছে রাস্তার ওপর দিয়ে চলে যাওয়া বারে। কতদূর গেলে ওয়াশ ম (অ ামেরিকানরা টয়লেট বলেনা, বলে ওয়াশ ম) এবং রিফ্রেশমেন্টের জায়গায় আছে, সে তথ্যও ঝোলানো রয়েছে রাস্তার উপর দিয়ে।

কনেকটিকট্ রাজ্য ছড়িয়ে এরপর আমরা প্রবেশ করলাম ম্যাসাচুসেটস্ রাজ্যে। এ রাজ্যটি ও ছোট, ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই পার হয়ে গেলাম। তারপরে ঢুকলাম নিউ হ্যাম্পশায়ার রাজ্যে। ঘন্টায় ৭০/৮০ মাইল বেগে গাড়ি ছুটছে, বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য নির্মল অ ানন্দের উৎস। কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা ঠান্ডা গাড়িতে বসে থাকতে থাকতে শরীর একেবারে জমে যাচ্ছে। তাই দুঘন্টা বাদে বাদেই আমরা একেকটা রেস্ট হাউসের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বেলা চারটে নাগাদ আমরা নিউ হ্যাম্পশায়ার রাজ্য ছড়িয়ে আমেরিকার সব চ াইতে উত্তর - পূর্বের মেইন - এ প্রবেশ করলাম।

বিকেল সাড়ে চারটে থেকে শু হয়ে গেল জলাভূমি আর জলাভূমি। পথের বাঁদিকে স্থলভূমি আর ডানদিকে খাল - বিল - লেক আর নদীর মোহনা; যার সঙ্গে আমাদের সুন্দরবনের কিছুটা মিল পাওযা যায়। এইভাবে চলতে চলতে বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমরা একটা গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। গ্রামটির নাম সিয়ার্সপোর্ট। পুরোপুরি কৃষক আর মাঝিমাল্লাদের গ্রাম। গ্রামের ঘরবাড়িগুলিও বেশ নতুন ধরনের। পরিষ্কার বোঝা যায় এখানে ইংরেজ আর ফরাসি দুটো জাতেরই ঐতিহ্যের মিশ্রণ ঘটেছে। স্থানীয় লোকেদের ভাষায় ভেতরেও কিছুটা ফরাসি প্রভাব এসেছে। রাজ্যটির পশ্চিম দিকে ফরাসি ভাষী প্রদেশ কুইবেক আর পূর্বদিকে স্টিমারে করে ঘন্টা দুয়েকএগোলেই কানাডার নোভা স্কোটিয়া। সেখানেও ফরাসি ভাষায় প্রভাব খুব বেশি।

গ্রামটির অপরূপ সৌন্দর্য আমাদের মোহিত করে দিল। ঠিক করলাম এই গ্রামটিতেই বেশ কিছুক্ষণ থাকবো। এও ঠিক হল যে, আমরা পাঁচজন পায়ে হেঁটে ঘন্টাখানেক যে যার খুশিমত বেড়াব। হাঁটতে হাঁটতেই, আমি এক কৃষকের বাড়ির কাছাকাছি এলাম। তার বাড়িটি ভেতর থেকে বন্ধ। বাড়ির পিছনদিকে চাষবাসের জন্য এক মস্ত বড় গ্রিন হাউস, আর বাড়ির সামনের দিকে খোলা মাঠের মধ্যে কাঠের খুঁটি পুঁতে কাঠের দেওয়াল দিয়ে একটা ছোট্ট অস্থায়ী সবজির দোকান। দোকানটি দেখে যতটা মজা লাগল ঠিক ততটাই কৌতুহল হল। দোকানটির সামনে গিয়ে দেখি মস্ত বড় কাঠের টেবিলে অন্তত ১২-১৪ রকমের তাজা শাক শবজি সাজানো আছে। আর দেওয় ালের হাতে লেখা একটা কাগজ সাঁটা; তাতে লেখা সেলফ্ - সার্ভিস, অর্থাৎ তরিতরকারি - শাকসবজি যার যা দরকার নিজেকেই তুলে নিতে হবে। ঘরে এক কোণায় একটা ওজন করার মেশিনও আছে। সেই ওজনের মেশিনে ক্রেতাকে নিজে নিজেই তার কেনা শাক সবজিগুলি ওজন করে নিতে হবে। পাশেই হাতে লেখা একটা ছোট্ট কাগজে মূল্য তালিকা দেওয়া আছে ওজন হনুযায়ী কোন্ সবজির কত দাম হল এবং সব কিছু মিলিয়ে কত টাকার জিনিস কেনা হল তা ঠিক করে ক্রেতাকেই একটা বাক্সের মধ্যে সেই টাকা ফেলে দিয়ে আসতে হবে। দোকানের সবজির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি লেটুস শাক, ব্লু বেরি ফল এবং নানা রকমের গ্রিন ভেজিটেবল্ - বাঁধাকপি, ক্য াপসিকাম, জুকিনি, বীনস, বীট গ্রীনস্ শশা, স্কোয়াশ, টোমাটো ইত্যাদি।

তাজা সবজির মজার দোকান। কিন্তু কাছে পিঠে কোন মানুষ নেই, না ক্রেতা না বিক্রেতা। এ মজার দোকানের ভিতরে ব্যাপারটা জানার জন্য একটা রোখ চেপে গেল। সামনের কৃষক বাড়িতে গিয়ে একটু ডাকাডাকি করলাম, কোন সাড়াশব্দ নেই। দরজা দিয়ে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বেরিয়ে আসছেন।

আমি এগিয়ে গিয়ে গায়ে পড়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম সামনের এই দোকানটি কি আপনাদেরই? দেখুন, আমি বাইরের অন্য একটি দেশ থেকে বেড়াতে এসেছি। এই রকমের অদ্ভুত দোকান, আমার জীবনে কখনও দেখিনি। এখানে কে ান বিক্রেতা নেই কেন? শাক্ - শবজি ফল - মূলগুলিকে সব বেওয়ারিশ ফেলে রাখা হয়েছে কেন? যে কোন লোক এসে একটা গা নিএতে করে সব তুলে নিয়ে যেতে পারে। কাজেই দোকানটি একেবারে সাপ হয়ে যেতে কয়েকমিনিটের বেশি লাগার কথা নয়।

ভদ্রলোক আমার কথা শুনে অবাক হয়ে বললেন, তা কেন হবে? বিনা পয়সায় কে এই সামান্য তরকারি নিয়ে যাবে? (দ্রুতবেগে আমার চোখের সামনে আমার দেশের গ্রামগঞ্জের দোকান। পাটগুলির ভেসে উঠল। সেকথা এই সরল বৃদ্ধ বিদেশীকে বোঝানো যাবে না।) ত ারপরে ভদ্রলোক বললেন, তুমি খুব সাধারণভাবে এই দোকানটার অর্থনীতি বুঝতে চেষ্টা কর। আমি একজন কৃষক, আমার জমি প্রচুর

আর ফসলও ফলে বেশ ভালই। সামনে যে গ্রিন হাউসটা দেখছ, ওটাও আমারই। সব মিলিয়ে দিনে ২০০ - ২৫০কেজি ফসল ওঠে। শহরের বড় পাইকরা এসে কোনদিন ১৫, কোনদিন ২০০ কেজি কিনে নিয়ে যায় প্রতিদিনই ৫০-১০০ কেজি সব্জি খুচরো বিক্রির জন্য পড়ে থাকে। এইবার আমার পারিবারিক অবস্থাটা দেখো। আমার দুই ছেলে বড় হয়ে কাজকর্ম নিয়ে শহরে চলে গেঝে, গ্রামের এই বাড়ি আর ক্ষেত নিয়ে আমরা বুড়োবুড়ি এখানে থাকি। এখন এই খুচরো ফসল বিক্রির জন্য আমি যদি একজন কর্মচারী রাখি, তাহলে তাকে আমার মজুরি দিতে হবে দিন প্রতি ৫০ ডলার। আর এখানে যত সবজি দেখছো, সেগুলির দাম সব একসঙ্গে করলেহবে বড়জোর ৭০ ডলার । মাত্র কুড়ি ডলার আয় করার জন্য আমি ৫০ ডলার দিয়ে একজন দিন মজুর রাখব কেন? তার চাইতে এই ৭০ ডলারের মালই যদি খোলাভাবে রেখে দি, তাহলে আমার পুরো ৭০ ডলার না হলেও অন্তত ৬৫ ডলার তো উঠবেই। কাজেই সেটাই, আমার বড় লাভ। আর এই তুচ্ছ জিনিস নিতে কেউ কি আর চুরিচামারি করে?

আমি কোন উত্তর দিলাম না। শুধু ভাবলাম পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্য দেশ আমার মাতৃভূমি ভারতবর্ষের যে কোন জায়গায় এই রকম একটা দোকানঘর খুলে তার পরিণাম কী হতো?